হে মহাজীবন

বিবেকানন্দ

হে মহাজীবন
বিবেকানন্দ

হীরেন ঘোষ

৩৫২৩

শিশুস্বপ্ন প্রকাশন
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

উনিশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে একের-পর-এক আবির্ভূত হয়েছিলেন উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্ক। এই বড়োমাপের মানুষদের প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আমাদের দেশ। ইতিহাসে এই সময়কে বলা হয় নবজাগরণের কাল।

এই নবজাগরণের ব্যক্তিত্বদের নিয়েই আমাদের 'হে মহাজীবন'। এই মহাপ্রাণ মনীষীদের ছেলেবেলার কথা, জীবনের পথে তাঁদের লড়াই, তাঁদের গভীর দেশপ্রেম, তাঁদের দয়া মায়া ভালোবাসায় পরিপূর্ণ মহৎহৃদয় আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি একালের ছেলেমেয়েদের কাছে। চেয়েছি আমাদের দেশের উজ্জ্বল অতীতকে তাদের জানাতে। ছোট্ট ভাইবোনরাও ভালোবাসুক দেশ ও দেশের মানুষকে। স্বপ্ন দেখুক এইসব স্মরণীয় মানুষদের মতো হওয়ার।

নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

VIVEKANANDA by Hiren Ghosh

প্রচ্ছদচিত্র ঈশা মহম্মদ

প্রচ্ছদ নামাঙ্কন প্রবীর সেন

প্রকাশক চুমকি চট্টোপাধ্যায়

শিশুস্বপ্ন প্রকাশন

১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

SISHUSWAPNA PRAKASHAN

1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700 009

Price ₹ 30.00

মুদ্রাকর হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস

১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম টা. ৩০.০০

সিমলের দত্তবাড়ির ছোট্ট ছেলে বিলে ভয়ানক ডানপিটে। ভয়ডর মোটে নেই। বিলেকে নিয়ে পাড়ার বুড়ো দাদুর বড়ো ভাবনা। তাঁর বাগানের চাঁপাগাছে উঠে বিলে তার বন্ধুদের নিয়ে দোল খায়, লাফ দিয়ে নীচে পড়ে। কখন যে হাত-পা ভাঙবে কে জানে। অনেক ভেবে একটা উপায় বের করে সেদিন বিকেলে দাদু বিলেদের বললেন,—ওরে চাঁপা গাছে এক ভয়ংকর ব্রহ্মদত্যি বাস করে। রেগে গেলেই ঘাড় মটকে দেয়। তোরা আর চাঁপাগাছে উঠিসনে।

দাদুর কথা শুনে বিলের বন্ধুদের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। ছেলেরা গুটি-গুটি বাগান থেকে চলে গেল। দাদু ভাবলেন, যাক, ব্রহ্মদত্যির কথায় কাজ হয়েছে। কিন্তু তিনি তো বিলেকে চেনেননি। বিলে সন্ধেবেলায় গিয়ে উঠল চাঁপাগাছে।

মনের আনন্দে দোল খেল। কোথায় ব্রহ্মদত্যি? কিছুই দেখতে পেল না। ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে বুক ফুলিয়ে বলল,—দাদু ভয় দেখাতে চেয়েছিল। অত সোজা? নিজের চোখে না দেখেই বিশ্বাস করব? আগে যাচাই করে দেখব তবে মানব।

এমন ডানপিটে ছেলেকে নিয়ে মা ভুবনেশ্বরী দেবীর ভারি চিন্তা। দুই মেয়ের পরে শিবঠাকুরের পুজো করে এই ছেলে পেয়েছেন। শিবের বরে ছেলে, তাই নাম বীরেশ্বর। ডাক নাম বিলে। সে দিনটি ছিল পৌষ-সংক্রান্তি। পাড়ার ঘরে-ঘরে পৌষ-পার্বণের আনন্দের সঙ্গে দত্তবাড়িতেও আনন্দের বাণ ডাকল। হাইকোর্টের নামজাদা উকিল বিশ্বনাথ দত্তের পুত্রলাভ হয়েছে। ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি বিলের জন্ম।

বিলে যত বড়ো হচ্ছে, তত তার দুষ্টুমি বাড়ছে। মা-র মনে বড়ো ভয়। কখন কোথায় কী বিপদ ঘটায় কে জানে? এই তো সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে চড়কের মেলা থেকে শিবঠাকুরের পুতুল কিনে বাড়ি ফিরছিল। আচমকা দলের ছোটো ছেলেটা রাস্তায় নেমে পড়েছে। উলটোদিক থেকে ছুটে আসছে ঘোড়ার গাড়ি। এই বুঝি চাপা পড়ল! লোকজন হইহই করে উঠল, বিলের কী সাহস! এক লাফে রাস্তায় নেমে টান মেরে ছেলেটিকে সরিয়ে আনল। বেঁচে গেল ছেলেটা!

সব শুনে মা-র বুক আনন্দে ভরে উঠল। ভাগ্যিস, বিলে ছিল। গর্বে তাঁর মুখ আলো হয়ে যায়। তবে ছেলের ওপর রাগও কম হয় না। কেউ এসে কিছু চাইলেই বিলে সব বিলিয়ে দেয়। সংসারের জিনিস অমন করে গরিবদের বিলিয়ে দিলে চলে? একদিন তিনি রাগ করে দোতলার ঘরে বিলেকে আটকে রাখলেন। বিলে আর কী করে? জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে।

এমনসময় এক গরিব ভিখিরি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইল। কেউ তার কথা কানেই নেয় না। বিলে দেখল মা'র শাড়ির বাক্সে তালা নেই। চটপট বাক্স খুলে দামি-দামি শাড়ি ছুড়ে দিল ভিখিরির দিকে। আহারে! বড্ড গরিব। শাড়ি বেচে পয়সা পাবে। লোকটির হাসিমুখ দেখে বিলের সে কি আনন্দ!

বিলের দুষ্টুমি যখন খুব বেড়ে যেত তখন মা তাকে চেপে ধরে একঘটি

জল 'শিব, শিব' বলে মাথায় ঢেলে দিতেন। অমনি সব দুরন্তপনা ভুলে বিলে শান্ত হয়ে যেত। আবার মা দুপুরে যখন রামায়ণ, মহাভারত পড়তেন, বিলে কোলের কাছে চুপটি করে বসে এক মনে শুনত। তাকে দেখে কে বলবে দুরন্ত ছেলে? কথক ঠাকুরের কথকতা শুনেও বড়ো মজা পেত। এইসব পুরাণের গল্প শুনে-শুনে বিলে এক নতুন খেলা বের করে ফেলল। 'ধ্যান' 'ধ্যান' খেলা। সে ছবিতে দেখেছে ঋষিরা শিরদাড়া সোজা করে বসে ধ্যান করেন। সে-ও বন্ধুদের নিয়ে ধ্যান শুরু করল। ধ্যানে বসে সে কিন্তু একটুও ফাঁকি দিত না। এক মনে ধ্যান করত। বাইরের কোনো কিছুতে হুশ থাকে না। একদিন তো ধ্যানের সময় ঘরে একটি সাপ ঢুকে পড়েছিল, বিলে বুঝতেই পারেনি।

বিশ্বনাথ দত্ত নামি উকিল। তাঁর বাবা দুর্গাচরণ দত্ত-ও উকিল ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। দুর্গাচরণের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পঁচিশ বছর বয়েসে তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। বিশ্বনাথবাবু ছিলেন উদার মনের মানুষ। দু-হাতে যেমন টাকা আয় করতেন, খরচও করতেন অঢেল। আত্মীয়-স্বজন, গরিব-দুঃখী, চাকর-বাকরে বাড়ি ভরে থাকত। তা ছাড়া অনেক মক্কেলও আসত তাঁর বাড়ি। বৈঠকখানায় সাজানো থাকত নানারকমের হুঁকো।

অত হুঁকো দেখে বিলে একদিন চাকরের কাছে জানতে চাইল 'অত হুঁকো কেন'?

চাকর বলল,—কত জাতের মানুষ আসে এখানে। এক-এক জাতের জন্য এক-একটি হুঁকো। এক জাতের হুঁকোয় অন্য জাতের লোক মুখ দিলে তার জাত যায়।

ব্যস, বিলের মাথায় ঢুকল জাত কেমন করে যায় তা দেখতে হবে। বললেই হল জাত যায়? পরীক্ষা না করে মানব কেন? একদিন সুযোগ বুঝে বিলে একে-একে সব হুঁকোয় টান দিতে লাগল। বিশ্বনাথবাবু তো বিলের কাণ্ড দেখে অবাক! আরও অবাক হলেন সব কথা শুনে। তিনি কিন্তু মোটেই রাগ করলেন না। তিনি নিজেও নানান বই পড়তেন। মোটেই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। জাতপাতের বিষয়ে তেমন মাথাও ঘামাতেন না, মানতেনও না। তিনি সহজ কথায় ছেলেকে সব বুঝিয়ে দিলেন।

তবে বিলে যে দিনরাত কেমন দুষ্টুমি করে বেড়াত তা নয়। পড়ার সময় মনোযোগ দিয়ে পড়া শুনত। তার পড়ার ব্যাপারটা ছিল খুব মজার। বাড়িতে মাস্টারমশায় আসতেন। বিলে তাঁকে পড়া বানান করে পড়তে বলত। তিনি সেইভাবে পড়ে যেতেন। বিলে শুনে-শুনেই সব বানান, পড়া শিখে ফেলত। নিজেকে বেশি পড়তেই হত না।

এমনি করে করে বিলের বয়স হয়ে গেল ছয় বছর। বিশ্বনাথবাবু তাকে মেট্রোপলিটান স্কুলে ভরতি করে দিলেন। স্কুলের খাতায় বিলের নাম উঠল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিলে থেকে নরেন, তারও পরে পৃথিবী বিখ্যাত ভারতের আত্মার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। এবার বলব নরেন থেকে বিবেকানন্দ হওয়ার ইতিহাস।

স্কুলে ভরতি হয়ে নরেন নতুন-নতুন বন্ধু পেলেন। তিনি ছিলেন যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমান আর মেধাবী। তাই সহজেই শিক্ষক মশায় আর ছাত্রদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। মনোযোগ দিয়ে স্কুলের পড়া শেষ করতেন। তাই হাতে যথেষ্ট সময় থাকত। সেই অবসর সময়ে তিনি ব্যায়াম করতেন, লাঠি খেলতেন, গান শিখতেন। কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না। আবার কেউ যদি তাঁর সামনে অন্যায় কাজ করত, তাকেও ছেড়ে কথা কইতেন না। স্কুলের বইয়ের বাইরেও নানা বিষয়ের বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো ছেলে তাঁর স্কুলে ছিল না।

স্কুলে পড়ার সময় তাঁকে দুই বছর মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে থাকতে হয়েছিল। কলকাতা থেকে রেলগাড়ি, তারপরে গরুর গাড়ি—হাঁটা পথে অনেকটা পথ, তিনি সেই প্রথম কলকাতার বাইরে গেলেন। ভারতের চেহারা এই প্রথম তাঁর চোখে পড়ল। রায়পুর যেতে তাঁর জীবনেও ঘটেছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। বিন্ধ্যপর্বতের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে একটা বিরাট মৌচাক। অসংখ্য মৌমাছি। মৌচাক আর মৌমাছিদের ব্যস্ততার মধ্যে তিনি যেন আমাদের এই পৃথিবীর মিল খুঁজে পেলেন। এই জগৎ সংসার, তার সৃষ্টিকর্তার কথা—এসব ভাবতে-ভাবতে তিনি সবকিছু হারিয়ে ফেললেন। তার আর জ্ঞান রইল না। তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে রইলেন। পরবর্তী জীবনে বিবেকানন্দ বলেছিলেন ধ্যানে চৈতন্য লোপ পাওয়া সেই তাঁর প্রথম ঘটেছিল।

রায়পুরে যে দু-বছর নরেন ছিলেন তা মোটেই বৃথা যায়নি। বিশ্বনাথ দত্ত এই দুই বছর নরেনকে নিজের মতো করে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দুই বছর পরে রায়পুর থেকে ফিরে এসে তিনি আবার মেট্রোপলিটানে ভরতি হলেন। প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে ও গভীর মনোনিবেশের ফলে স্কুলের পড়া সহজেই বুঝে ফেললেন। ১৮৭৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কলেজের শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৮৮৪ সালে বি.এ. পাশ করলেন।

ছাত্রাবস্থায়ই নরেন দর্শন ও নানা ধরনের বই পড়তেন। এইসব বই পড়ে তাঁর মনে চিন্তা এল—আমি কে? ঈশ্বর কে? এই বিশ্বজগৎ, তার নিয়মকানুন এতসব ফুল পাখি, পাহাড় পর্বত—কে সৃষ্টি করেছেন? কে-ই বা পালন করছেন? ঈশ্বরকে কি চোখে দেখা যায়? এইসব চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি স্থির করলেন এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতেই হবে। না জানা পর্যন্ত থামবেন না। সত্যকে জানতেই হবে।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নানা জনের কাছে গেলেন। রাত জেগে ধ্যান করেন। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পান না।

১৮৮১ সাল। সিমলে পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি। সেই বাড়িতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়ির পূজারি। রামকৃষ্ণদেবের নাম নরেন্দ্রনাথ আগেই শুনেছিলেন। সুরেশ মিত্র নরেনকে নিয়ে গেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে গান শোনাবার জন্যে, ঠাকুর তো গান শুনে খুব খুশি। বললেন,—একবার দক্ষিণেশ্বরে যেও।

এফ.এ পরীক্ষা শেষ। নরেন এখনো তার প্রশ্নের উত্তর পায়নি ভগবান কে? তাঁকে কি দেখা যায়? অনেক ভেবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সরাসরি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি ভগবানকে দেখেছেন?

ঠাকুর হাসলেন,—হ্যাঁরে, তোকে যেমন দেখছি, তেমনি দেখেছি। তুই যদি আমার কথা শুনে চলিস, তোকেও দেখাতে পারি।

নরেন শুনলেন। কিন্তু অত সহজে তো বিশ্বাস করা যায় না। যাচাই না করে মেনে নেবেন কেমন করে।

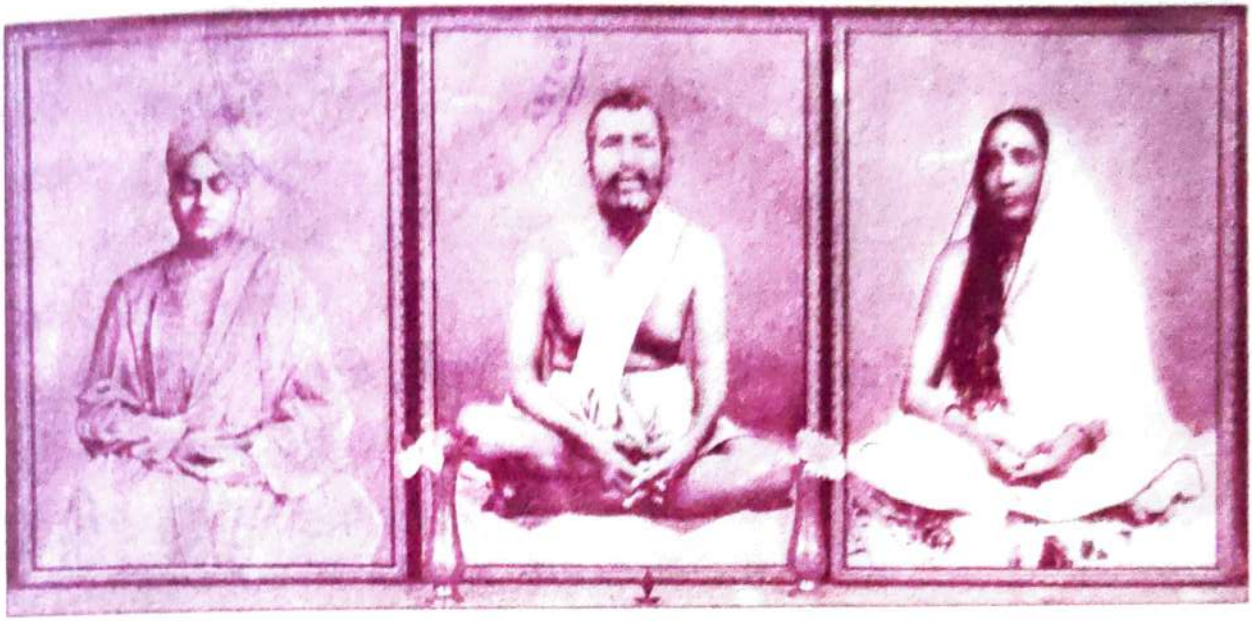

একমাস পরে নরেন আবার দক্ষিণেশ্বর গেলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নরেনের চারদিকের সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর শরীরের বোধ, তিনি যে নরেন—তাও লোপ পেয়ে গেল। সারা পৃথিবী প্রবল বেগে ঘুরতে-ঘুরতে মহাশূন্যের দিকে ছুটে চলেছে।

নরেন চিৎকার করে উঠলেন,—ঠাকুর, তুমি আমার এ কি করলে? আমার যে মা-বাবা আছেন।

ঠাকুর তাঁর বুকে হাত দিলেন। নরেন আবার সবকিছু দেখতে পেলেন। ঘর-দোর, লোকজন, নিজেকে। কী একটা ম্যাজিক যেন ঘটে গেল। নরেন ভাবতে লাগলেন এ কেমন করে হয়? এভাবে কোনো শক্তি দিয়ে আমার সব জ্ঞান, চেতনা, বিদ্যাবুদ্ধি ভুলিয়ে দিলেন? মানুষটি কি সত্যিই ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন? ঈশ্বরের শক্তি পেয়েছেন?

নাহ, এতেও বিশ্বাস হয় না। আরও পরীক্ষা করতে হবে। তবেই মানব। নরেন শুনেছেন, ঠাকুর টাকাপয়সার স্পর্শ সহ্য করতে পারেন না। তিনি একদিন লুকিয়ে ঠাকুরের বিছানার নীচে একটা ধাতুর টাকা লুকিয়ে রাখলেন। ঠাকুর অজান্তে বিছানায় বসেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেন। নরেনের কাজ বুঝতে পেরে ঠাকুর হাসলেন, ঠিকই তো। না বাজিয়ে মানবি কেন?

এইভাবেই বারবার পরীক্ষা করে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয়

নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এই সেই মানুষ, যিনি তাঁকে সৃষ্টিকর্তার রূপ চিনিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর মনের সব অস্থিরতা দূর করে দেবেন। তিনি মনে-মনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুর পদে বরণ করে নিলেন। রামকৃষ্ণদেবও নরেনকে বড়ো ভালোবাসেন। দু-দিন না দেখলেই অস্থির হয়ে পড়েন।

১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রনাথ বি.এ. পরীক্ষা দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বাবা মারা গেলেন। বিশ্বনাথ দত্ত যেমন দু-হাতে অর্থ উপার্জন করেছেন, খরচও করতেন নানাভাবে। তাই তিনি মারা যাওয়ায় নরেন অকূল সমুদ্রে পড়লেন। চারদিকে ঋণ। ঘরে অভাব অনটন। মা-ভাইদের দু-বেলা দু-মুঠো ভাত দিতে পারেন না। তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তাঁর মন ভেঙে যায়। অনেক চেষ্টা করেও চাকরি পেলেন না। তিনি ভাবলেন রামকৃষ্ণদেবকে গিয়ে দুঃখের কথা বলবেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

ঠাকুর সব শুনে বললেন,—আজ মঙ্গলবার। রাতে মা'কে প্রণাম করে যা চাইবি মা তোকে তাই দেবেন।

নরেন রাতে কালীমন্দিরে গেলেন। মা-কে প্রণাম করে তাঁর দিকে চাইলেন। সব দুঃখ দূর হয়ে নরেনের মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি হাতজোড় করে প্রার্থনা করলেন,—মা, আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। তোমাকে যাতে সর্বদা দেখতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও।

রামকৃষ্ণদেব তিন-তিনবার নরেনকে মায়ের মন্দিরে পাঠালেন। কিন্তু তিনি একবারও ভাত-কাপড়ের অভাবের কথা বলতে পারলেন না। চাইলেন জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক। ঠাকুর হেসে বললেন,—আচ্ছা, তোর মা-ভাইয়ের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না।

রামকৃষ্ণদেব আনন্দে সবাইকে ডেকে বললেন,—নরেন মাকে মেনেছে। নরেন্দ্র সারারাত প্রাণ ঢেলে গাইলেন—'মা ত্বং হি তারা'।

১৮৮৫ সালের মধ্যভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলায় ঘা হল। চিকিৎসকেরা বললেন,—ভয়ংকর রোগ। কর্কট রোগ। জীবনের আশা কম। ভক্তরা তাঁর সেবা

ও চিকিৎসার সুবিধার জন্যে প্রথমে কলকাতায়, পরে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলেন। নরেন ও তাঁর বন্ধুরা প্রাণপাত করে ঠাকুরের সেবা করেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুই কী চাস?

নরেন উত্তর দিলেন,—পাঁচ-ছয় দিন শুকদেবের মতো সমাধিতে থেকে সামান্য কিছু খেয়ে আবার সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই।

ঠাকুর রেগে বললেন,—তোর লজ্জা করে না? তুই বটগাছের মতো হয়ে কত লোকজনের ছায়া দিবি, আশ্রয় দিবি—তা না করে নিজের মুক্তি চাস। তোকে লোকশিক্ষা দিতে হবে।

নরেন বলেন,—আমি ওসব পারব না।

ঠাকুর উত্তর দেন,—মা ঘাড়ে ধরে তোকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।

১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করলেন। মায়ের কাজ, লোকশিক্ষার কাজ দিয়ে গেলেন নরেনের ওপর। নরেনকে নিজের সব শক্তি দিয়ে মৃত্যুর আগে ঠাকুর বললেন,—তোকে সব দিয়ে আজ আমি ফকির হয়ে গেলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর সুরেশচন্দ্র মিত্রের দেওয়া টাকায় বরাহনগরে একটি পুরোনো বাড়ি ভাড়া করে নরেন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে

সেখানে আস্তানা নিলেন। দিনরাত সাধনভজনে ডুবে থাকেন। নামকীর্তন করেন। খাওয়া জোটে না। তবুও ঠাকুরের নাম করতে-করতে তাঁরা অপার আনন্দে ডুবে থাকেন।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে নরেন ও তাঁর ভক্ত-সঙ্গীরা বিরজা হোম করে সংসারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গেরুয়া বস্ত্র পরলেন। নরেনের সন্ন্যাস-নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৮৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ভ্রমণে বের হলেন। নিজের চোখে দেশটাকে ভালো করে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। দিনের-পর-দিন পায়ে হেঁটে নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলেন।

স্বামীজি বুঝলেন, যতদিন না এই দীনদরিদ্র ভারতবাসীদের দু-মুঠো অন্ন দিতে পারছেন ততদিন ধর্মের কথা শুনিয়ে লাভ নেই। অশিক্ষা দূর করতে না পারলে দেশের মঙ্গল আসবে না। দেশের রাজা-মহারাজারা নিজেদের নিয়েই মশগুল। নিজেদের ভোগ বিলাসেই মত্ত। প্রজাদের দুঃখকষ্ট বোঝার মন নেই। তিনি নানা প্রদেশে ভ্রমণের সময় সেইসব অঞ্চলের রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রজাদের দুঃখ দূর করার অনুরোধ করতেন। স্বামীজির স্বভাব আর তেজস্বিতা দেখে অনেক মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ল। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সবাই তাঁকে সম্মান করত। মহারাজারা তাঁকে সাদরে বাড়িতে নিয়ে যেতেন, ধর্মকথা শুনতেন। তাঁর নির্দেশ মেনে দেশের লোকের উন্নতি করার চেষ্টা করতেন। স্বামীজি জাতপাত ভুলে সকল মানুষকে বুকে টেনে নিলেন।

ভারত ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি কন্যাকুমারীর সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেলেন।

স্বামীজি নিজের মুক্তির চিন্তা ছেড়ে মানবজাতির মুক্তির সংকল্প নিয়ে কন্যাকুমারীকা থেকে ফিরে এলেন। যতদিন না মানবজাতির উন্নতির কাজ শেষ না হয় ততদিন তিনি নিজের মুক্তি চান না।

এই সময়ে আমেরিকায় শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসভার আয়োজন চলছে। ভারতে সে খবর এসে পৌঁছেছে। শিষ্যরা ঠিক করলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা স্বামীজিকে শিকাগো পাঠাবেন। অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হল। স্বামীজি একদিন দেখলেন ঠাকুর তাঁকে ডাকতে-ডাকতে সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুরের

ইচ্ছার কথা জেনে তিনিও ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। খেতড়ির রাজা স্বামীজির পোশাক-পরিচ্ছদ আর যাত্রার আয়োজন পাকা করে ফেললেন।

১৮৯৩ সালের ৩১ মে। স্বামী বিবেকানন্দ বোম্বাই থেকে পেনিনসুলা জাহাজে চড়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে চিন জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে ৩০শে জুলাই শিকাগো শহরে পৌঁছলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। শিকাগো শহরের 'কলম্বাস' হলে ধর্ম মহাসভার উদ্বোধন হল। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা মঞ্চের ওপরে বসেছেন।

বিকেলবেলা। স্বামী বিবেকানন্দের নাম সভায় ঘোষণা করা হল। তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর গেরুয়া বসন, মাথায় পাগড়ি আর অসাধারণ সুন্দর শরীর থেকে যেন তেজ আর পবিত্রতার আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্বামীজি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে ভাষণ শুরু করলেন—'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ—'

তাঁর কথা শেষ হল না। সভার সব শ্রোতা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। এমন আত্মীয়ের মতো সম্বোধন তো এতক্ষণ কোনও প্রতিনিধি তাদের করেননি। এই সম্বোধনেই স্বামীজি যেন সকল আমেরিকাবাসীকে নিমেষে আপন করে

নিলেন। বক্তৃতার শুরুতেই ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান।

প্রথম বক্তৃতাতেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে ফেললেন। শিকাগো শহর স্বামীজিকে নিয়ে মেতে উঠল। মানুষের ভালোবাসার কথা, তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা, আপন করে নেওয়ার কথা এমন করে আমেরিকাবাসীদের কেউ বোঝায়নি। জটিল তত্ত্বকথা, শুকনো ধর্মালোচনা শুনতে-শুনতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। স্বামীজির দরদভরা আহ্বান শুনে তারা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রোতারা অধীর হয়ে অপেক্ষা করত কখন স্বামীজি বলবেন। তাঁর ভাষণ শোনার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। স্বামীজি ধর্ম মহাসভায় দশ-বারোটা ভাষণ দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের নানা ভুল ধারণা ছিল। স্বামীজিকে দেখে, তাঁর ভাষণ শুনে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার ওপরে তাদের শ্রদ্ধা ফিরে এল। ভারতের মহান ও উচ্চ আদর্শকে মেনে নিল। স্বামীজি ধর্মসভার শেষে বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা করলেন। বহু শিক্ষিত ধনী-দরিদ্র তাঁর শিষ্য হলেন, সন্ন্যাসী হলেন।

স্বামীজি ইংল্যান্ডে গেলেন। ইংরেজি কাগজ লিখল, 'ইনি বুদ্ধ ও খ্রিস্টের মতোই একজন মহাপুরুষ''। এখানেও অনেকে তাঁর শিষ্য হলেন। মিস মার্গারেট নোবেল তাঁর শিষ্যা হলেন। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে তিনি বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন। ভারতের মানুষের দুঃখ দূর করতে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর জীবন দান করেছিলেন। ইংল্যান্ডের নানাস্থানে বক্তৃতা করে হিন্দুধর্ম ও

ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা বলতে লাগলেন।

পৃথিবী জয় করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি সিংহলের কলম্বো বন্দরে এসে নামলেন। বহুদিন পরে স্বদেশের মাটিতে পা রাখলেন। জাহাজঘাটায় ভিড় আর ধরে না। ভারতবাসীরা তাদের হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় করে স্বামীজিকে বরণ করে নিল।

মাদ্রাজ হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি স্বামীজি এসে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলেন। তাঁর বাল্যের কলকাতা। তাঁর প্রিয় জন্মস্থান। এই শহরেই না তিনি ছোটোবেলায় কত দুষ্টমি করেছেন। বিশ্বজয়ী বীরকে বরণ করতে স্টেশনে লোক ভেঙে পড়ল।

বরাহনগর মঠে স্বামীজির সঙ্গীরা একইসঙ্গে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। স্বামীজির ডাকে তাঁরা আবার মঠে সমবেত হলেন। স্বামীজি বললেন,—ভগবান ভেবে মানুষকে সেবা করতে হবে।

হঠাৎ সেবার কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল। বহু লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। স্বামীজি তার সন্ন্যাসী ভাইদের নিয়ে সেবার কাজে নেমে পড়লেন। সেবা করতে গেলেও টাকা লাগে। তিনি বললেন, —টাকার জন্যে ভেবো না। দরকার হলে মঠের জমি বিক্রি করে দেব।

স্বামীজি গঙ্গার পশ্চিমতীরে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে জমি কিনেছিলেন। সেই জমি বেচে দেওয়ার কথা শুনেই দেশের লোক অধীর হয়ে উঠল। তারা দু-হাত ভরে টাকাপয়সা পাঠাতে লাগল। স্বামীজি

সেই টাকায় রোগীর সেবা করতে লাগলেন। তিনি বললেন,—নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করলে টাকার অভাব হয় না।

১৮৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। বরাহনগর থেকে মঠ গিয়েছিল আলমবাজারে। বেলুড়মঠের জমিতে পুজো করে স্বামীজি বললেন, —ঠাকুর, দীর্ঘকাল এখানে থাকো। লোকের মঙ্গল করো।

বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র হল। তাকে ঘিরে দেশে-বিদেশে গড়ে উঠল আরও অনেক কেন্দ্র। মিশনের প্রধান কাজ হল ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া, রোগীর সেবা, বিপদে-আপদে আর্তের পাশে দাঁড়ানো। সেইসঙ্গে ধর্মের সত্যিকার মঙ্গলময় রূপ প্রচার করা। মানুষকে সেবা করা।

দেশের উন্নতির কথা, মানুষের মঙ্গলের কথা স্বামীজি সবসময় ভাবতেন। তিনি বলতেন,—দেশের কল্যাণের জন্য দরকার হলে আমি নরকেও যেতে রাজি আছি।

স্বামীজি একদিন বেলুড়মঠে সাঁওতাল কুলিদের প্রাণভরে লুচিমণ্ডা খাওয়ালেন। গরিব মানুষগুলো এসব কখনো খায়নি। আনন্দে খুশিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আজ আমার নারায়ণ সেবা হয়ে গেল।

১৯০২ সালের ৪ জুলাই। সারাদিন জপে-তপে কাটালেন। ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত শেখালেন। আজ যেন বেশ ভালো বোধ করছেন। সন্ধেবেলা নিজের ঘরে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। রাত আটটায় সেবককে ডেকে মাথায় হাওয়া করতে বললেন। নিজে জপের মালা নিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাত নয়টা। হঠাৎই তাঁর দেহটা বার দুই কেঁপে উঠল। শিশুর মতো ঘুমের ঘোরেই যেন একটু কেঁদে উঠলেন। দু-বার গভীর শ্বাস নিলেন। তারপরই তিনি ডুবে গেলেন মহাসমাধিতে।

জীবন-পঞ্জি

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি (বঙ্গাব্দ ১২৬৯) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান উত্তর কলকাতার হেদুয়ার কাছে শিমুলিয়া পল্লীতে। পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত। মাতা ভুবনেশ্বরী। ছেলেবেলার নাম বীরেশ্বর। ডাকনাম বিলে। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান স্কুলের খাতায় নাম লেখানো হল নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৮৭৭ ১৪ বছর বয়সে স্বাস্থ্যলাভের জন্য মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গমন।

১৮৮০ অল্প কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ কলেজে ভরতি হন।

১৮৮৬ রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গুরুভ্রাতাদের সহযোগে বরানগরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' স্থাপন।

১৮৯০ জুলাই মাসে সহযাত্রী গঙ্গাধরকে নিয়ে ভারত ভ্রমণ। এখান থেকে শুরু হল তাঁর পরিব্রাজকের জীবন। এবং সেইসঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়ন।

১৮৯৩ মে মাসে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা। ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজির স্মরণীয় বক্তৃতা।

১৮৯৫ বিবেকানন্দের সঙ্গে বিদেশিনী মিস্ মার্গারেট নোবলের সাক্ষাৎ। ইনি পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত হন এবং স্বামীজির আহ্বানে ১৮৯৮ সালে ভারতে আসেন।

১৮৯৭ স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দেশবাসী কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৯ ভারতের মর্মবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে পুনরায় পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা।

১৯০০ প্যারিসে হিন্দু ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে ফরাসি ভাষায় ভাষণ দান। ওই বছরেই ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯০২ ৪ জুলাই বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ।
বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে—

১) পরিব্রাজক (১৯০৩)
২) বর্তমান ভারত (১৯০৫)
৩) ভাববার কথা (১৯০৫)

শিশুস্বপ্ন প্রকাশন
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

পরিবেশক
পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

Rs. 30.00